

দ্রৌপদী ও চিন্তামণি উপাখ্যান রবীন বসু

আমাদের গল্পের দ্রৌপদী কিন্তু মহাভারতের সেই বিখ্যাত রমণী না। এ দ্রৌপদী সুন্দরবন অঞ্চলের কুলতলী থানার আন্ধারিয়া গ্রামের গৃহবধূ দ্রৌপদী পয়ড়া। স্বামী চিন্তামণি পয়ড়া স্ত্রীর চেয়ে মাথায় বেশ কিছুটা খাটো। হয়তো বুদ্ধিতেও। কেননা, সংসারের যাবতীয় সিদ্ধান্তই দ্রৌপদী নিত। চিন্তামণি যত শান্তশিষ্ট গোবেচারার, দ্রৌপদী ঠিক তার উলটো। সব সময় যেন জ্বলছে, বলকাচ্ছে। তার আগুনের তাপ যতই অসহ্য হোক চিন্তামণি তাকে সহনীয় করে নিয়েছে নিজের স্বভাবগত ঔদাসীন্য ও সারল্য। তার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মনে কোনও দ্বেষ বা হিংসা কাজ করে না। গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের তিলক রোগাটে রুগ্ন নিরীহ শরীরে এটাই বৈশিষ্ট্য। গ্রামের আর পাঁচজনের থেকে তাকে আলাদা করেছে। নিজের জমিজিরেত নেই। বাস্তুর লাগোয়া এক টুকরো বাগানে নানান সবজি ফলায়। তাতেই চলে যায়। এছাড়া তার বাড়ির সামনের বারান্দা ঘিরে ছোট একটা মুদিদোকান দিয়েছে। গাঁয়ের লোক সেখান থেকে সময়ে অসময়ে তেল ডাল মরিচ-মশলা কেনে। সেজন্য অবশ্য চিন্তামণিকে সপ্তাহে একদিন ভ্যানরিফ্রা ডেকে জয়নগরে গঞ্জের হাটে যেতে হয় মাল আনতে। সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব নেই তাদের সংসারে।

দ্রৌপদীর ব্যাপারটা আলাদা। সে স্বপ্ন দেখে বড় লোক হবে। সচ্ছল পরিবারের গৃহবধূদের মতো গা-ভর্তি সোনার গয়না পরে ঘুরে বেড়াবে। মুখে পান নিয়ে নাকের নথ দুলিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে পাড়ার প্রতিবেশী বউ-ঝিদের কাছে সুখের গল্প করবে। তার মনে একটাই দুঃখ, তার কোনও সন্তান নেই। সেজন্য সে চিন্তামণিকেই করে। বলে, ‘এমন মেনিমুখো হাড়গিলে মানুষ কি বাপ হতে পারে! ওর দম নেই।’

প্রতিবেশী সনকাবউ জানতে চেয়েছিল, ‘তা’লে তুমি অমন কমজোরি পুরুষকে বে’করলে কেন? তায় আবার তোমার থেকে অনেক খাটো মাতায়।’

‘সেটা তো আমিও ভাবি রে বউ, কেন করলুম!’

তারপর দ্রৌপদী যা বলেছিল সনকা বউকে, তা হল— ‘বাবার কীর্তনের দল ছেল। চিন্তা সেখানে গান গাইত। ভারি মিষ্টি গলা। বাবা চাইত ওকে একদিন মূল গায়ের বানাবে। আমি ওর অমন দরদভরা গলা শুনে মন দিয়ে ফেললুম। বাবা রাজি হল না।

শেষে একদিন দু’জন রাতের আঁধারে পেইলে এলুম এই গাঁয়ে। তোমার বর সুখন্যদা মাঝে মধ্যে কীর্তন শুনতে যেত। চিন্তার সঙ্গে ভাব হল। সব শুনে বলে, চলে আয়। আমাদের গাঁয়ে। জায়গার ব্যবস্থা করে দোব, ঘর বানিয়ে নিস। সেই পালিয়ে আসা। কণ্ঠবদল করে বে’। একবার গলার তুলসির মালাটায় হাত বোলায় দ্রৌপদী। কিন্তু এখন দ্রৌপদীর রাগ হয়। মনে করে বড় ভুল হয়ে গেছে। রাতের পর রাত তাকে উপোসি থাকতে হয়। নারী জীবনের চরম সুখ সে পেল না। চিন্তার মধ্যে পৌরুষ কম আর সখী ভাব বেশি। আশাভঙ্গের বেদনায় নীল হতে হতে দ্রৌপদী কেমন কর্কশ রক্ষ ও হৃদয়হীন হয়ে গেছে। সব সময় অঙ্গারের মতো জ্বলছে।

সেই অঙ্গারের তেজ আর দ্রৌপদীর মুখঝামটা তাচ্ছিল্য সয়ে সয়ে চিন্তামণিও এখন ক্লান্ত। সে গানে আর তেমন মন বসাতে পারে না। দ্রৌপদীকে নিয়ে তার মনে বিরূপ ভাব জাগে। দোকানে বসেছিল মন খারাপ করে। এমন সময়—

“বলি, ও চিন্তাদা, একশো সরষের তেল আর দুটো ডিম দেবে। ‘বাতাসি এসে দাঁড়ায়। দোকানের ঝাঁপ ফেলবে ফেলবে করছিল চিন্তা। বেলা বেশ হয়েছে। এবার চান-খাওয়া সারতে হবে।’ দ্রৌপদী কটা কাপড় নিয়ে পুকুরঘাটে কাচতে গেছে।”

“দোব না কেন! তবে ডিমের দাম বেড়েচে। জোড়া চোদ্দ টাকা।”

“সে কি গো। এই তো সেদিন নিলুম, ছ’ টাকা করে নিলে।”

তখন কম ছেল। এখন অন্ধ্রপ্রদেশে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। ‘অনেক মুরগি মারা গেছে, জলে জলময় রাস্তাঘাট। কলকাতায় ডিম আসচে নে, তাই দাম বেড়েচে।’

‘ওঃ! তাই বলো।’ ‘বাতাসি দুলে ওঠে। ওর শরীর- ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে চিন্তামণি। বাতাসি যখন দোকানে আসে চিন্তার মনের মধ্যে এক আকুল আর্তি জেগে ওঠে। কেন জানি না, ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যেটা দ্রৌপদীকে দেখলে হয় না। বাতাসির শরীরে যৌবন আছে, কিন্তু তা খর নয়, লাবণ্যে ভরা। দ্রৌপদী যদি রুখাশুখা করকরে বালি হয়, তো বাতাসি পেলব কমণীয় মাটি। ওর রূপে তেজ নেই, স্নিগ্ধতা আছে। চিন্তার বৈষ্ণব মন তাতে সিনান করতে চায়।’

চিন্তা পাত্র মেপে সরষের তেল দেয়। ঠোঙায় ডিম মুড়ে বলে, ‘এই নে, বাতাসি।’ বাতাসি মুঠো থেকে টাকা বের করে চিন্তার হাতে দেয়। ‘পাঁচ টাকা কম আছে, পরে দে’ দোব।’

চিন্তা হেসে বলে, ‘ধার কিন্তু বাড়ছে। সুদ লাগবে!’

বাতাসিও ঘাড় ঘুরিয়ে শরীর নাচিয়ে বলে যায়, ‘দোবো, বাবা দোবো। সুদও দোবো!’

বাতাসির সংসার বলতে এক বুড়ি বিধবা মা। মাতার পাড়ায় ওরা থাকে। বাপ বে' দিয়েছিল, কিন্তু মাতাল চরিত্রহীন বে-রোজগেরে স্বামীর মার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিল। দাদাদের মুখ বেজার হয়েছিল। বাপের মৃত্যুর পর দুই দাদা সব সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে বুড়ি মা ও বোনকে আলাদা করে দেয়। শুধু মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দিয়েছিল। গোয়াল ঘরের পাশের ছোট ভাঁড়ার ঘরটা। বাতাসি বিচার জানিয়েছিল পঞ্চায়েতে। দাদারা কাগজ দেখায়, জমি সব নাকি বাবা ওদের দুই ভায়ের নামে দানপত্র করে দিয়ে গেছে। বাতাসি বুঝতে পারে ওরা মিথ্যে বলছে। সব ফন্দি। কপাল চাপড়ে আর গালমন্দ করতে করতে মা-মেয়ে ফিরে এসেছিল।

সেই থেকে লড়াই শুরু বাতাসির। লোকের বাড়ি কাজ করে, হাঁস-মুরগি পুষে সে দুটো পেটে অন্ন জোগায়। রাতে বিছানায় শুয়ে অতৃপ্ত যৌবনের তাড়নায় ছটফট করে। আর চোখের জল ফেলে। চিন্তাদাকে তার ভাল লাগে। তার গান ভাল লাগে। কী দরদ দিয়ে রাধাকৃষ্ণের পালা গায়। বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। তার শূন্য জীবনে কখন যে চিন্তা কৃষ্ণ হয়ে বসেছে সে বুঝতে পারেনি। বয়সে অনেক বড় বিবাহিত চিন্তাদাকে কোনও দিন সে তেমন ভাবে পাবে না, তবু মন মানে কই!

‘বলি ও বাতাসি! শুনচিস!’

ঘরের পিছনে জানলার ধারে ফিসফিসে গলা। চমকে ওঠে বাতাসি। বুকটা কেঁপে যায়। ‘ও মাগো’ বলে উঠে দাঁড়ায়। বুকে থুতু ছিটিয়ে জানলার ধারে যায়। দেখে, চিন্তা দাঁড়িয়ে। ভাগ্যিস, মা এখন ঘুমিয়ে গেছে। নিচু স্বরে বলে, ‘তুমি একেনে এত রাত্তিরে কেন?’ সে অবাক।

‘কাল পালা গাইতে যাবো গরানকাটি। ফেরার পথে কলোনির মেলা ঘুরে আসব, যাবি নাকি!’

বাতাসির লোভ হয়। কতদিন কোথাও যায়নি। কলোনির পৌষ সংক্রান্তির মেলা দেখা তার খুব ইচ্ছে। রাঙা চুড়ি কিনবে। একবার নাগরদোলা চড়বে। জিলাপি খাবে! নারী জীবনের কত শখ তার অপূর্ণ রয়ে গেল! সে দোনা মোনা করছিল।

‘কিরে, যাবি?’ চিন্তা আবার তড়া দেয়।

‘যাবার তো খুব ইচ্ছে। কিন্তু মা যদি যেতে না দেয়!’

চিন্তা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। শেষে বলে, ‘মাকে বলবি সংসারের জিনিস কিনতে যাচ্চিস।’

‘যদি জানতে চায় কার সঙ্গে যাবো!’

‘বলবি, আমার সঙ্গে। তা’লে জেঠিমা না করবে না।’

‘তা অবিশ্যি ঠিক। তুমি এখন যাও। কে দেখে ফেলবে। আমি ভোরের দিকে ভেড়ির পাড়ে গিয়ে দাঁড়াব।’

কাক ডাকার আগেই তারা বেরিয়ে পড়ল। লাল ডুরেকাটা একটা শাড়ি পরেছে বাতাসি। সঙ্গে ম্যাচ করে রাউজ। চুল খোঁপা করেছে কাঁটা গুঁজে। ভারি সুন্দর আর মোহময়ী লাগছে ওকে। চোখ ফেরাতে পারছে না চিন্তা। সে বাতাসির একটা হাত ধরে। রাধাঅঙ্গ স্পর্শে কৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হয়। বাতাসির মুখে উদিত সূর্যের লাল আভা। শুধু যমুনা না, এটা পিয়ালি নদীর পাড়। আর কদমের জায়গায় সারি সারি গৈয়ো গরান বাইন গাছ দাঁড়িয়ে। তাতে ক্ষতি নেই। আমাদের রাধাকৃষ্ণ এখন পরকীয়া প্রেমে আকুল হয়ে গরানকাটির দিকে যাচ্ছে।

মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল। পাখিরা ঘরে ফিরে আসছে। মাঠের গরু ছাগল তারাও ধুলো উড়িয়ে ঘরের পথে। বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যের শাঁক বেজে উঠেছে। বাতাসির মনে হল, মা এবার বকবে। সন্ধ্যা দিতে হবে। তবুও আজ সে খুব খুশি। দারুণ মজা হয়েছে। এতদিনের জীবনে এই প্রথম সে অন্য এক অনুভূতির স্বাদ পেল। তার সব সাধ মিটিয়েছে চিন্তাদা। তার বর যদি এমন হত! একে কী প্রেম বলে! সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা ভয় এল। মনে লজ্জা। দ্রৌপদী খুড়ির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। চিন্তাদাকে ভালবাসা অন্যায়। এতে কলঙ্ক আছে। যেমন রাধার হয়েছিল। কলঙ্ক নিয়ে বাঁচতে পারবে না বাতাসি। সে তাড়াতাড়ি চিন্তাকে বলে, ‘তুমি পরে এসো। আমি আগে যাই। লোকে দেখলে বদনাম দেবে।’ বাতাসি দৌড়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

চিন্তা বাড়ি ঢোকার মুখেই থমকে গেল। বাড়ির ভিতর থেকে দ্রৌপদীর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজার মুখে পাড়ার মেয়ে-বউরা জটলা করে দাঁড়িয়ে। চিন্তাকে দেখে মেয়েরা একটু সরে যায়। কিছুটা এগোতেই চিন্তা দেখে দ্রৌপদী সুর করে বুক চাপড়ে কাঁদছে। — ‘বলি আমার একি সর্বোনাশ হল গো-ও-ও! আমার সুখের ঘরে ওই ডাইনি পোড়ারমুখী ভাতারছাড়া মাগি বাতাসি নজর দিয়েছে গো-ও-ও...!’

চিন্তাকে দেখে সে কান্না দ্বিগুণ হল। হতচকিত চিন্তা বুঝতে পেরেছে দ্রৌপদী কোনও ভাবে জেনে গেছে বাতাসিকে নিয়ে আজ মেলায় যাওয়ার কথা। গাঁয়ের কেউ হয়তো দেখে এসে বলে দিয়েছে। এখন সে কী করবে! কীভাবে ম্যানেজ দেবে! প্রথমে সে চেষ্টা করে ওঠে, ‘বলি সরো তো মেয়েরা! তোমাদের কি কাজ নেই ঘরে! মজা দেখতে এসেছো সবাই! যাও- ভাগো!’

মেয়েদের জটলা একটু পাতলা হতে চিন্তা কাঁধের খোল মাটিতে নামিয়ে রেখে দ্রৌপদীর হাত ধরে। ‘চলো বউ, ঘরে চলো। কী হয়েছে!’

কান্নাভেজা গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে দ্রৌপদী। ‘কী হয়েছে! ন্যাকা, কিচ্ছু জানো না! কাকে নিয়ে অভিসারে গিয়েছিলে!’

‘ওঠো, ঘরে চলো। সব বলছি।’ চিন্তার গলায় মিনতি।

দ্রৌপদীর কান্না আরও বাড়ে। ‘ভেতরে ভেতরে এতো! বলি দ্রৌপদী কমতি কিসে! চোঁড়া সাপ আবার ফণা তুলেছে!’

চিন্তা একরকম জোর করে ডানা ধরে বউকে ঘরে নিয়ে যেতে চায়। আহত সাপিনি এবার গর্জন করে। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে চিন্তাকে আঘাত করে। তবু চিন্তা বউকে ঘরে নিয়ে যায়। বিছানায় বসিয়ে মাথায় পাখার বাতাস করে। বউটা তার বড্ড রাগী! দ্রৌপদী কিছুটা শান্ত হতে চিন্তা বলে, ‘তুমি তো আমাকে দু’চোখে দেখতে পারো না। আমি নাকি চেন্ডশ! মেনিমুকো কমজোরি পুরুষ! তোমায় সুখ দিতি পারিনে। তা আমি কোতায় গেলুম, কার সঙ্গে গেলুম তাতে তোমার কী!’

দ্রৌপদী বাঘিনীর মতো গর্জায়। ‘না, কক্ষনো যেতি পারবেনে। আমি তোমার কণ্ঠবদল করা বউ। আমাকে ছেড়ে গেলি পাপ হবে!’

‘ঠিক তো, তোমাকে ছেড়ে গেলে আমার পাপ হবে। জয় গৌর! জয় নিতাই! আমি কোথাও যাবো না। ‘চিন্তা বউয়ের মাথায় হাত বুলায়। দ্রৌপদী কিছুটা শান্ত হয়।’ বলে, ‘বাতাসি বলল, চিন্তাদা, তুমি তো গায়েন কণ্ঠি গরানকাটি যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। ওখানে মেলা বসেছে। কতদিন মেলায় যাইনি। আমার মনটা নরম হল। সত্যি তো মেয়েটা স্বামী ছাড়া। কোনও সখ ওর মেটেনি। তাই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম মেলা দেখতে। ওর সঙ্গে আমার অন্য কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি বিশ্বাস করো।’

‘সত্যি বলছো!’ দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

‘সত্যি!’

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা ভাবে দ্রৌপদী তাকে এখনো এতো ভালোবাসে! সেই আগের মতো। নাকি এটা তার অধিকারবোধ। স্বামীর উপর নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দেওয়া। ওর হতাশা শূন্যতা সন্তানহীনতা হয়তো ওকে তার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর করেছে। আবার উলটো দিকে দ্রৌপদীর অবহেলা রক্ষতা দখল করার প্রবণতা চিন্তাকে হয়তো তার থেকে দূরে সরিয়েছে! এই ভাবনার মধ্যেই চিন্তা দেখল দ্রৌপদী বিছানায় উঠে বসেছে। সে ঝুঁকে আসে চিন্তার দিকে। তারপর আবেগে কতদিন পর স্বামীকে সপ্রেম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। চিন্তার সব দুঃখ মনখারাপ আর পরকীয়া ভাবনা মুহূর্তে কর্পুরের মতো উবে যায়।